নিরালা ও নজল

স্বপ্না চ্যাটার্জী

সাহিত্য এবং সংস্কৃতি মানব সভ্যতার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে আছে প্রাচীন যুগ থেকে। সঙ্গীত, নৃত্য থেকে গুহা-শিল্প প্রাচীন ভারতকে আজও এক অন্যতম জায়গায় ধরে রেখেছে। ঘটনা-দূর্ঘটনা ভারতীয় সংস্কৃতিকে বার বার আঘাত করলেও তার মূল ভাবধারাকে ধবংস করতে সক্ষম হয়নি। সাহিত্যকার এই লক্ষ্যে তাঁদেরর প্রয়াস নিজের মত করে যুগ যুগ ধরে অক্ষুন্ন রেখেছেন। মধ্যযুগে কবির ও তুলসী দাস তাঁদের কাব্যধারায় ভারতকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। আধুনিক যুগে অতি লোকপ্রিয় দুই কবি - হিন্দিতে সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী যিনি নিরালা নামেই বিশেষ পরিচিত ও বাংলায় কাজী নজল ইসলাম সঙ্কুচিত চিন্তাভাবনার ঊর্দ্ধে উঠে ভারতবষের রাষ্ট্রিয় - সংস্কৃতিক- একতাকে এক নতুন মাল ায় নতুন কলে গেঁথেছেন। এই দুই বরেণ্য কবিকে এক মঞ্চে তুলে ধরার সামান্য একপ্রয়াস আলোচ্য নিবন্ধ।

- দুজনেরই ব্যাক্তিগত জীবনের ঘটনাক্রমের মধ্যে আশ্চর্য এবং অদ্ভুত এক মিল লক্ষ্য করা যায়। দুই কবির জন্ম একই যুগে ঊনিশ শতকের শেষ দিকে, এবং একই প্রান্তে অর্থাৎ বাংলায়। দুজনই মা- বাবার ভালবাসা থেকে ছিলেন বঞ্চিত। দুজনের পারিবারিক জীবনও সুখের ছিল না। নিরালা তাঁর কন্যা সরোজ ও নজল তাঁর পুত্র বুলবুলের হঠাৎ মৃত্যুতে এত আহত এবং বিচলিত হয়েছিলেন যে পরবর্তি জীবন প্রায় অনাসক্ত যোগির মত কাটিয়ে গেছেন। দুজনেই প্রচন্ডআর্থিক সংকটে কাটিয়েছেন এবং শেষ জীবনে বিক্ষিপ্তভাবে মারা যান। দুজনেই বিদ্রোহী কবি এবং সমাজের বৈষম্য ও অত্যাচ ারের বিদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। দুজনেই মাইকেল মধুসুদন দত্ত থেকে মুক্ত ছন্দের প্রেরণা নিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে সৌন্দর্য্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং স্বামীজী ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক প্রভাবে লেখায় গভীরতা পেয়েছেন। দুজনেই বাংলার স্যষ্য শ্যামল ভুমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। দুজনই যুগানুকূল ভাষা, ছন্দ, ভাবাধারার ক্ষেত্রে নতুনভাবে প্রয়োগ করেছেন। দুজনেরই গদ্য ভান্ডারে আধিক্য সত্বেও তাঁদের সর্বকালীন মহত্ব কবিপেই স্বীকৃতি পেয়েছে। দুজনই সাহিত্যের পরস্পরাকে ভেঙ্গেছেন, দুজনই নিজের মত করে গ ান লিখেছেন ও গেয়েছেন। সঙ্গীত শাস্ত্রেরউপর পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকার কারণে দুজনেরই গান খুব লোকপ্রিয় হয়েছে। সামাজিক পরম্পরার বিদ্ধে চলার ফলেদুজনকেই সামাজিক ও ধর্মীয় আচার্যদের আঘাত সহ্য করতে হয়েছে এবং ১৯৩০ সালের পর দুই কবিতা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্মান পান এবং যুবসম্প্রদায়কে উদ্দীপ্ত করেন। নিরালা ও নজলের কাব্যসৃজনের সময় ১৯২০ থেকে ১৯৪০ এর মধ্যে । ১৯৪০ এর পর নজল মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন ও নিরালার ১৯৪৫ এর পর থেকে সাহিত্য রচনা ধীরে ধীরে কমে আসে। দুই কবিই বিদ্রোহের বার্তা নিয়ে সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন এবংপরে নিজেদের শক্তির সীমা বুঝতে পেরে পরম - শক্তিমান পরমেরের শক্তির গুণগান করতে করতে সাহিত্যের ক্ষেত্র ত্যাগ করেন।

আগেই বলেছি, নিরালা ও নজলের কাব্যপ্রতিভার উদয় মোটামুটি একই সময়ে ও একইভাবে। নিরালার প্রথম কাব্যসংগ্রহ অনামিকা মাত্র ন'টা কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়। এই কবিতার মধ্যে পুরানো সাহিত্য ধারার প্রতি বিদ্রোহই

লক্ষিত হয়। কিন্তু তা সত্বেও নিরালা হিন্দি মহাকবিদের শ্রেণীতে স্থান পেয়ে যান। নজলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' মাত্র বারটা কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাগুলির মধ্যে বিদ্রোহের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকায় প্রকাশনার সাথে সাথেই ব াংলায় তার জয়গান শু হয় ও নজলের নাম শ্রেষ্ঠ কবিদের সারিতে স্থান করে নেয়। দুজনেই প্রাণ ভরে কবিতা রচনা করেছেন, নিরালা তাঁর চরিত্রকাব্য 'তুলসী দস' কে নিয়ে লিখেছেন ও 'সরোজ স্মৃতি ' তে শোকগীত এর উৎকৃষ্ট উধ াহরণ রেখেছেন ও নজল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিতে 'চিত্তনামা ' লিখেছেন।

প্রকৃতি, প্রেম ও রাষ্টিয় জাগরণ দুই কবির কাব্যেরই মূল বিষয়। দুজনই রাষ্ট্রবাদী চেতনা ও জাগরণের গান গেয়েছেন। দুজনের কাব্যেই আশার পাশাপাশি রয়েছে নিরাশা। নিরালা 'বেলা ' কাব্যে উর্দু-ফরাসী শৈলীতে গজল রচনা করেছেন এবং নজল 'জঞ্জির ' ও 'নির্ঝর ' এ উর্দু - ফরাসী শৈলী প্রয়োগ করেছেন। দুজনই কাব্যে যুগের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির প্রতি সূক্ষ্ম তৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন। ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি, আর্থিক শোষণ ও সামন্তবাদী সংস্কৃতির বিদ্ধে যে গতিশীল প্রভৃত্তি সংঘর্ষ চলছিল তাকে ভাষায় প দিলেন নিরালা ও নজল। যুগের পীড়া, বৈষম্য ও দুঃখ দৈন্যের প্রতি অ াক্রোশ, সমষ্টিগত মানবতার স্থাপনার কামনা ও আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ দুই মহাকবির রচনায় মুখরিত। এর সঙ্গে এক হয়ে মিশে আছে বিমানবতার উদ্বোধন ও দার্শনিক চিন্তাশীলতা। নিরালা ও নজল দুজনেই দীর্ঘ ও লঘু আকারের কবিত ায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নিরালার 'কুকিরিমুত্তা ', 'সরোজস্মৃতি ', 'সেবাপ্রারম্ভ' ও 'স্বানী প্রেমানন্দজী মহারাজ ' কবিতাগুলিকে দীর্ঘ কবিতার আখ্যা দেওয়া যায়। নজলের 'চত্তনামা ', 'বিদ্রোহী ', 'কামালপাশা ', 'তুমি মোরে ভুলিয়াছো ', 'রিফ সরদ ার ', 'পূজারিণী ', 'সাম্যবাদী ', 'সিন্দু ', 'খালেদা ', 'জাগো সুন্দর চিরকিশোর' দীর্ঘ কবিতার শ্রেণীতে পড়ে। নিরালার 'পঞ্চবাটী প্রসঙ্গ ' ও নজলের 'কামালপাশ ' ও 'জাগো সুন্দর চিরকিশোর ' কে গীতিনাট্য বলা যায়। নিরালার 'রাম কি শক্তি পূজা ' এবং 'তুলসী দাস' ও নজলের 'মভাক্কর ' রচনাগুলিকে বিশেষ শ্রেণীতে ফেলা হয়। এই রচনাগুলিতে কথার অংশ সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্বেও ভাষার তারতম্যে সুন্দর ও পান্ডিত্যপূর্ণ, ছন্দ সুগঠিত, মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক পরিবেশ সংস্কৃতিক চিত্রণ ও কল্পনার বিশেষ প্রয়োগের ফলে এঁদের প্রবন্ধ - শৈলীতে- লেখা কাব্য বলা হয় ।আধুনিক যুগের পরিস্থিতি ও জটিলতার জন্য পরম্পরাগত কাব্য মাধ্যম অপর্যাপ্ত মনে হয়েছে। নিরালা ও নজল নতুন বক্তব্যকে নতুন মাধ্যমে বলার চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষে আজ গীতিকাব্য নামে যে কাব্যধারা প্রচলিত তার মূল প্রাচীন ভারতে পাওয়া যায় না। ইটালি, ফ্রান্স, ব্রিটেনে এই কাব্যধারা প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। ভারতের এই কাব্যধারা সর্বপ্রথম বাংলায় দেখা যায়। মুক্তছন্দ এরই ধারা। ম াইকেল মধুলুদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখেছেন। নজলও ছন্দের স্বাধীনতা বজায় রাখেন। নিরালা মধূসুদন ও রবীন্দ্রনাথ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গীতিকাব্য লিখেছেন। শিল্প - ও বিষয়বস্তু - এই দুই দৃষ্টিতেই নিরালা ও নজলের গীতিকাব্যে বিশেষ মিল আছে। তাঁদের সঙ্গীত রচনায় ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতি ও বিদেশী সঙ্গীত পদ্ধতি - এই দুই ধারার এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রভাব দেখা যায়। শাস্ত্রীয় রাগরাগিনীর প্রভাবে লেখা গান, ভারত-পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও লয়ের মিশ্রণে লেখা গান, লোকগীতি, ভজন ও উর্দু ছন্দ-বিধানে লেখা গান--- মূলতঃ এই পাঁচটি রূপই তাঁদের গানে ফুটে উঠেছে। শ াস্ত্রীয় রাগরাগিনীর আধারে লেখা (নিরালার 'পরিমল ') গানে ধামার রাগের সুন্দর প্রয়োগ করা হয়েছে।

'পাণ -ধনকো স্মরণ করতে, নয়ন ঝরতে নয়ন ভরতে, স্নেহ ওতপ্রোত, সিন্ধু দূর শশীপ্রভা দৃগ, অশ্রু জোৎস্না স্রোত।'

আবার 'জুহিকি কলি ' তে ভারতীয় - পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিশেষ সমন্বয় দেখা যায়। 'বিজন -বন- বল্লরী পর , শোতিথি সুহ াগভরী, স্নেহ-স্বপনি মগ্ন, আমল- গোমল - তনুতরনী- জুহি কি কলি ' । নিরালার গানের তৃতীয় রূপ হল লোকগীতি 'বেল া সংগ্রাহের ' গান এই শ্রেণীতে পড়ে।
'কালে কালে বাদল ছায়ে, না আয়ে বীর জওয়াহরলাল, ক্যায়সে ক্যায়সে নাগ মন্ডলায়ে, না আয়ে বীর জওয়াহরল াল।'

চতুর্থ রূপ 'ভজন ' --- 'অর্চনা ', 'আরাধনা 'ও 'গীতিকুঞ্জ ' এর গানে পাওয়া যায়।
'তজন কর হরি হরি কে চরণ, মন!/ পার কর মায়া বরন, মন!/কলুষকে করসে গিরে হ্যায়/ দেহত্রম তেরে ফিে
র হ্যায়'।
'বেলা সংগ্রহে' গানের আর এক রূপ দেখা যায় যাকে ফরসী - গজল বলা যেতে পারে। যেমন, 'কিনারা ওহ হামসে কীয়ে যা রহে হে/ দিখানেকো দরশন দিয়ে যা রহে হ্যায়।'

সংগীত শিল্পী হিসাবে নজল নিরালা থেকে বেশি সাফল্য পেয়েছেন কারণ সংগীত শাস্ত্র তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি মাত্রাবৃত্তি, স্বরবৃত্ত ও যৌগিক ছন্দের সফল প্রয়োগ করেছেন, তা সত্বেও তাঁর গানে চঞ্চলতা ও অস্থিরতা শেষ পর্যন্ত থেকেই গেছে। জন্মজাত মুক্তির উপাসক নজল অনেক ছন্দে পরম্পরাগত নিয়ম উল্লংঘণ করেছেন । তাঁর গনে হিন্দী, ইংরেজী ও আরবী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আঞ্চলিক গানের হাত ধরে তিনি জনসাধারণে ক াছে এসে ছিলেন। এই সম্বন্ধে টি.এস.এলিয়েট বলেছেন, / The Music of poetry must be latenes in the common speech of the poets place"

নজলের গীতিকাব্যে একটা বৈশিষ্ট্য হল তিনি ইরেজী 'স্ট্রেস রিদ্‌ম' বাংলা গানে সাফল্যের সাথে প্রবর্তন করেছেন। এক দিকে নজল কীর্তন, ভাটিয়ালি, বাউল, রামপ্রসাদী, ঠুমরী, গজল, ধ্রুপদ ইত্যাদি রাগরাগিনীর ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে বাংলা গানের প্রভাবও গ্রহণ করেছেন যেমন, ভক্তি সঙ্গীতে তন্ময়তা নিয়েছেন রজনীকান্ত থেকে, গম্ভীর ও উদ াস স্বর নিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় থেকে এবং ধ্রুপদ গানের প্রেরণা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে। এইভাবে প্রাচীন ও নবীনের সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। কখনো একাধিক রাগ - রাগিনীর সংমিশ্রণে গান লিখেছেন - ফরাসী ও সংস্কৃত ছন্দেরও অনুকরণ করেছেন।

, দুজনই প্রেমগীতে বিশুদ্ধ স্নেহের ছবি তুলে ধরেছেন। শারীরিক অপেক্ষা মানসিক দিকে জোর দিয়েছেন বেশি। নজলের গানে অতৃপ্তি ও বেদনার প্রাধান্য বেশি ও নিরালার গানে মিলনের । নিরালা ও নজলের গানে প্রকৃতির অপরিসীম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নিরালা ছায়াবাদী কবি তাই তাঁর কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্য ভান্ডারের প্রাবল্য। নজলের সব গানে (ব্রতচ ারী থেকে বিদ্রোহের গানে) প্রকৃতির নীরব ভূমিকা। দুজনই প্রকৃতির স্নিগ্ধ ও ভয়ানক পের বর্ণনা করেছেন কিন্তু নিরালার গানে স্নিগ্ধ ও সুকুমার পের বর্ণনাই বেশি পাওয়া যায়। 'পরিমল' এর লেখা গানে বর্ষা ও মেযের সুন্দর বর্ণনা পাই।

' অলি, ঘিরে আয়ে ঘন পাওসাকে / দ্রুম স্থির - কম্পিত থর থর থর/ ঝরতি ধারায়েঁ ঝর ঝর ঝর/ জাগতিকে প্রানোমে স্মর/ বেদ গয়ে কসকে।'
কিন্তু নজলের গানে প্রকৃতির বেদনা প প্রাধান্য পেয়েছে।

দুজনই গৃহী তাই তাঁদের গানে কবীর বা তুলসী দাসের ভক্তি খোঁজা বাতুলতা। কিন্তু ১৯৩০ সালে প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যুর পর নজল ও ১৯৩৫ এ আদরের মেয়ে সরোজের মৃত্যুর পর নিরালা অশান্ত মন নিয়ে প্রার্থনা গানের রচনা করেছেন। নিরালা প্রার্থনায় দীন-দুঃখীর উপর কৃপাদানের অনুরোধর সাথে সাথে ব্যাক্তিগত বেদনার প্রতিকারও চেয়েছেন। কিন্তু নজল প্রভুর কাছে সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তি, চেয়েছেন। নিরালা ও নজল দুজনকেই রাষ্ট্রকবিও বলা চলে । দেশ রাজনৈতিক ভাবে পরাধীন, আর্থিক ভাবে শোষিত ও সামাজিক পে দলিত অবস্থায় দেখা উভয়েই বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু নিরালাকে স্বাধীনতার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে দেখা যায়। এবং নজল বিদ্রোহ ও সংঘর্ষকে আহ্বাণ করেছেন। নিরালা ও নজলের আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় প্রবন্ধ- কাব্য সৃষ্টিতে। রাম কি শক্তি পূজা, তুলসী দ াস ও ম -ভাস্কর প্রবন্ধকাব্যকে Ballad বলা চলে। উভয়েই ভারতীয় প্রাচীন ও নতুন সংস্কৃতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

নিরালার জন্ম এক বৈষ্ণব পরিবারে হওয়ায় কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যে আসেন এবং ঘন্টার পর

ঘন্টা তাঁদের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনা শোনেন, স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়া থাকায় এই সব কিছুরই প্রভাব নিরালার উপরে গাঢ় ভাবে পড়েছে। নজলের জন্ম ও লালন পালন এক ধর্মপরায়ন মুসলিম পরিবারে। নানাভাবে ঘুরে ঘুরে বড় হয়েছেন। ধর্মের প্রতি গোঁড়া মানসিকতা না থাকায় তিনি সাধু সন্ন্যাসী বাউল সুফী মৌলবীসবার কাছেই সহজ ভাবে যেতে পেরেছেন।

কে অভিব্যাক্তির (Expressionism) শিল্পী হিসাবেও বিশেষ স্থান প্রদান করা যায়। এই তত্বকে (১) কাব্য- ভাষা, (২) ছন্দ-বিধান, (৩) অলংকার, (৪) বিম্ব ও প্রতিক, (৫) শব্দ-শক্তি- এই ভাবে ভাগ করা যেতে পারে।
(১) কাব্য- ভাষা কে আমরা ভাগ করতে পারি ঃ (১) জনসুলভ ভাষা, (২) মহাকাব্যের পান্ডিত্য ভাষা, (৩) দুরূহ ও দীর্ঘ সমাসিক ভাষা, (৪) নাদ প্রধান ভাষা, (৫) উর্দু- ফরাসী ও ইংরেজী মিশ্রিত ভাষা পে। নিরালা তাঁর কুকুরমত্যা তে খুব সহজ আটপৌরে ভাষা প্রয়োগ করেছেন যাতে সাধারণ লোকের কথ্যভাষাই প্রকাশ পেয়েছে -- আবে, শুনবে, গুলাব, ভুল মত যো পাই খুশবু, রঙ্গোয়ার।

তাঁর লেখা সেবাপ্রারম্ভ কবিতায় এক গরিব মুসলমান বালিকার মাটির কলসী ভেঙ্গে যাওয়ার বর্ণনায় বিভিন্ন প্রবাদকে ভেঙে কবিতার আকার দিয়েছেন-- ঘরা গিরা, ফুটা, দেখ বালিকাকা দিল টুটা.. নজলের লেখায় আমরা দেশের মাটির ভাষা দেখতে পাই। বুলফুল, ফনিমনসা, ভারার গান, সর্বহারা ইত্যাদিতে অতি সহজ ভাষার প্রয়োগ পাওয়া যায়। আব ার ..কান্ডারী হুশিয়ার.. কবিতায় দেখি ..কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যত ?/এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, দিতে হবে তরি পার। নিরালার লেখা ..পেযসী.. যমুনাকে প্রতি সন্ধ্যাসুন্দরী, বন- বেলা, জুহিকি কলি প্রভৃতি নজলের লেখা ..দোলন চাঁপা.., ছায়ানট, পূবের হাওয়া, সিন্ধু হিন্দোল, চোখের চাতক ইত্যাদি রচনায় পান্ডিত্য ভাষায় প্রয়োগ পাওয়া যায়, ঠিক এই ভাবে দুহ ও দীর্ঘ সমাসিক ভাষার প্রয়োগ দুজনই করেছেন। নিরালার ..গীতিকা, ও তুলসী দাস সম্পুর্ণভাবে ও পরিমল ও অনামিকার কিছু অংশ সাধারণ পাঠকের ভাষায় ধবনি উৎপন্ন করে এমন শব্দের প্রয়ে াগও হয়েছে। নিরালার লেখা ..ঝুম-ঝুম মৃদু গরজ -গরজ ঘনঘোর , রাগ-অমর! অম্বরকে ভর ভরও নিজ শের !, ঝর-ঝর নির্ঝর গিরি - সরমে, ঘর,ম, ত - মর্মর সাগরমে। এবং নজলের
..আগমণী কবিতায় লেখা ..একি রণ বাজে ঘন ঘন-, ঝন রন-রন ঝনঝন!, সেকি দমকী, ধমকী ধমকী, দামা-দ্রিমি
-দ্রমি গমকী গমকী, বহি কিনিকি চমকি, ঢাল তরোয়ালে ঘন - ঘন.. দেখা যায় ধবনি- শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ হয়েছে। নিরাল া তাঁর লেখা ..খুশখবরী.. কবিতায় উর্দু ও ইংরাজী ব্যাবহার করেছেন-..সুবহ সাম কিরণ য্যায়সে , জীবন সংগ্রম হমারা ছিরা, সত্য সিনেমাকী নটীসে নাচা, পুরবকা পায়া হিলা পশ্চিমমে । দষমন কি জান আই অফতমে, গলি গলি গলেকো গে ালে দাগে। কয়েদ পাসপোর্টকি নাহিতো কভি, দেশ আধা খালি হো গয়া হোতা..--- যেমন বিদ্রোহী কবিতায় নজল লিখেছেন - বলো মহা বিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি. চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি, ভুলোক দ্যুলোকগোলোক ভেদিয়া, খোদার অ াসন ..আরস.. ছেদিয়া , মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধবংশ, আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়মক ানুন শৃংঙ্খল -- এখানে ..খোদা.., ..আরস.., ..কানুন.. ইত্যাদি উর্দু ফরাসী থেকে নেওয়া এবং সাইক্লোন ইংরেজি থেকে।

উভয়েই নিজের মত করে স্বাধীনভাবে ছন্দের ব্যবহার করেছেন, ছন্দের নিয়ম ভেঙ্গেছেন এবং নতুন ছন্দের সৃষ্টি করেছেন। যেমন ঝড় কবিতায় কবি অমিত্রাক্ষর ও আরবের কাজবী ছন্দে ব্যাবহার করে এক নতুন আবেগময় ছন্দের সৃষ্টি করেছেন আবার একই ভাবে ইংরেজির Blank verse এবংRun onএর প্রয়োগও করেছেন।

অলংকারের ক্ষেত্রে দেখা যায় উভয়েই শব্দালংকার এবং অধলংকার সমান ভাবে ব্যবহার করেছেন । নিরালা তাঁর লেখ া ..সন্ধ্যাসুন্দরী, জাগো ফিরে এক বার, রাম কি শক্তি পূজা, তুলসী দাস.. প্রভৃতি রচনায় অনুপ্রাসের ব্যবহার করেছেন। যেমন, নজল তাঁর ..বিদ্রোহ্যী.. কবিতায় করেছেন। অর্ধলংকারের ক্ষেত্রে নিরালা উপমা ও রূপকের ব্যবহার করেছেন। বিম্ব ও প্রতিক (imagery and symbolism) এর ব্যবহারও দুজনের মধ্যেই পাওয়া যায়। নিরালা প্রকৃতি ও লোকজীবন

থেকে imageryনিয়েছেন, নজলের imageryরহস্যময়। তিনি প্রকৃতি ও লোকজীবনে রহস্যের সন্ধান করেছেন। প্রতীক এর ব্যবহার নিরালা ও নজল উভয়েই সমান ভাবে করেছেন। বিশাল কেসুক্ষ্ম পে দেখানোর জন্যই প্রতীক ব্যবহার বেশি হয়েছে। হিন্দী ও বাংলা কবিতায় যুগান্তর এনেছেন নিরালা ও নজল। দুজনের জীবন দর্শন ছিল মানবতাবাদ এর। দুজনেই মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হন নি।

কোন দুটি মানুষ বা সৃষ্টি হুবাহু এক হতে পারে না। সামান্য অসমানতা থাকা সত্বেও দুই কবি ও তাঁদের রচনা অনেক কাছের এই কথাটাই জোর দিয়ে বলার।
কৃতজ্ঞতা - ডঃ উপেন্দ্র কুমার শর্মার ..নিরালা ঔর নজল..

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com